# আরও এক বিপন্ন বিস্ময়

**সন্দীপন চক্রবর্তী**

> একটি মাত্র চোখ, হেমলকে প্রতিবিম্বিত চক্ষুসদৃশ, তাঁহার দিকেই, মিলন অভিলাষিণী নববধূর দিকে চাহিয়াছিল, যে চক্ষু কাঠের, কারণ নৌকাগাত্রে অঙ্কিত, তাহা সিন্দুর অঙ্কিত এবং ক্রমাগত জলোচ্ছাসে তাহা সিক্ত, অশ্রুপাতক্ষম, ফলে কোথাও এখনও মায়া রহিয়া গেল।
>
> — কমলকুমার মজুমদার, *অন্তর্জলী যাত্রা*, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

শুধু চলচ্চিত্র-পরিচালক নয়, বরং এক দ্রষ্টা। তাই ঋত্বিক ঘটকের কাহিনীচিত্রগুলোকে আঙ্গিকের চলচ্চিত্রগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে ছাড়াও, হয়তো আরেকভাবে পড়া যায়। তাঁর ছবিগুলির কয়েকটি মূল চরিত্রে আমরা এক বিশেষ প্রবণতা দেখি। *অযান্ত্রিক*-এ জগদ্দল এমন একটা সময়ে সম্পূর্ণ বিকল হয়ে পড়ে, যা না হলে বিমলের জীবন অন্য দিকে ঘুরে যেতে পারতো। *মেঘে ঢাকা তারা*-য় পরিবারের একমাত্র আর্নিং মেম্বার নীতার যক্ষ্মা ধরা পড়লেও সে নিজে নিজের কোনো চিকিৎসা করায় না। অর্থাৎ সে নিজেই বেছে নিতে চায় মৃত্যু। *সুবর্ণরেখা*-য় ঈশ্বর আত্মহত্যা করতে গিয়েও ব্যর্থ হয়। আবার পারস্পরিক বিচ্ছেদে ঈশ্বর ও সীতা উভয়েই মানসিক যন্ত্রণায় ছিল। ঈশ্বর প্রথম খদ্দের হিসেবে সীতার ঘরে ঢুকলেও, অবস্থার ওই চাপ

অতিক্রম করে ভাই-বোনের পুনর্মিলনও তো হতে পারতো। কিন্তু হয় না, বরং আত্মহত্যা করে সীতা। *তিতাস একটি নদীর নাম*-এ কিশোরের বউ তো জানতো যে উন্মাদ কিশোরের ঘনিষ্ঠ হতে গেলে উন্মাদনার বশে সে যা খুশি করতে পারে। তবুও সে যায় এবং এভাবেই মারা যায়। *যুক্তি তক্কো আর গপ্পো*-য় বিপ্বীদের ঘাঁটিতে নীলকণ্ঠ জোর করেই মৃত্যুসম্ভাবনার মধ্যে থেকে যায় এবং বলেও যে সে মরতে চাইছে। বারবার এই একই প্রবণতার পুনরাবর্তন হয়তো নিছক কাকতালীয় নয়, বরং চলচ্চিত্রকারেরই কোনো বোধের প্রতিফলন। কিন্তু বোধের মধ্যে কেন এবং কীভাবে তৈরি হয়ে ওঠে এই প্রবণতা? একে কি শুধুই 'মৃত্যুর নির্বাচন' অভিধায় ধরা যায়? নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও তো বাঁচার জন্য আর্তনাদ করে ওঠে নীতা! বিপ্লবীদের ঘাঁটিতে আসার আগেই তো নীলকণ্ঠ নতুনভাবে গড়ে তুলতে চায় তার জীবন! অর্থাৎ, এ-প্রবণতা হয়তো শুধু একমুখী নয়, এর মধ্যে ক্রিয়াশীল বহুমুখী নানা টানাপোড়েনের জটিল আলোছায়া। আর সেই নক্সাকেই স্পষ্টভাবে বোঝার চেষ্টায় শুধু কিছু প্রশ্নের উত্থাপন আছে এই লেখায়।

## পাতালমুখ হঠাৎ খুলে গেলে

> প্রকৃতির নিয়মসীমায় যে সহজ স্বাস্থ্য ও আরোগ্যতত্ত্ব আছে তাকে উপেক্ষা করেও কী করে মানুষ স্বরচিত জটিলতার মধ্যে কৃত্রিম প্রণালীতে জীবনযাত্রার সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারে এই হয়েছে আধুনিক সভ্যতার দুরূহ সমস্যা।
>
> — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'উপেক্ষিতা পল্লী', *পল্লীপ্রকৃতি,* ১৯৩৪

প্রমথেশ বড়ুয়ার *দেবদাস* (১৯৩৫), *মুক্তি* (১৯৩৭) প্রভৃতি ছবির মধ্যে দিয়ে বাংলা চলচ্চিত্রে এমন একধরণের নায়কের প্রতিষ্ঠা হলো যে আত্মপীড়িত, এমনকি আত্মধ্বংসী। এবং প্রমথেশ

বড়ুয়ার ছবিগুলির গুণমুগ্ধ ছিলেন ঋত্বিক। আবার আত্মধ্বংস ছাড়া আত্মোৎসর্গ রূপেও মৃত্যুর নির্বাচনকে আমরা চিহ্নিত করতে পারি ওই সময়ের সাংস্কৃতিক মানচিত্রে, যখন ঋত্বিক নিজেকে তৈরি করে তুলছেন। মনে পড়তে পারে বহুরূপীর *রক্তকরবী*/অভিনয়ের (১৯৫৬) কথা, রঞ্জন চরিত্রের ওই আত্মোৎসর্গ। রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রের পরবর্তীকালে বাংলা গদ্যসাহিত্যে আমরা পেয়েছি জগদীশ গুপ্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, কমলকুমার মজুমদার প্রভৃতি লেখককে, তাঁদের রচনাতেও নানা সময়ে এসেছে এই মৃত্যুর নির্বাচন। এমনকি মানিকের গল্পের শিরোনামই হয়ে ওঠে 'আত্মহত্যার অধিকার' বা তিনি লিখবেন 'শিল্পী'-র মতো গল্প। মানিকও গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন মার্কস ও ফ্রয়েডের তত্ত্বে। ওদিকে রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনেই শুরু হয়ে গেছে 'কল্লোল' ও 'কালিকলম' গোষ্ঠীর সাহিত্যচর্চা। ঋত্বিকের দাদা মণীন্দ্র ঘটক সেই সময়ের এক উল্লেখযোগ্য কবি। রবীন্দ্রোত্তর নানা কবিদের (সুধীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ প্রমুখ) লেখাতেও থাকছে এই প্রবণতার ইঙ্গিত। চর্চা হচ্ছে এলিয়টের কবিতার, যে এলিয়ট তাঁর চারপাশের 'পোড়ো জমি'-তে দেখতে পান দিব্যি বেঁচেবর্তে থাকা 'ফাঁপা মানুষ'-দের। এমনকি পরবর্তীকালে 'কৃত্তিবাস' ও 'হাংরি' গোষ্ঠীর কবিদের লেখাতেও এই প্রবণতাকে চিহ্নিত করা যায়।

ঋত্বিক নিজেও এক সময়ে সাহিত্যচর্চা করতেন। ফলে তাঁর বোধনির্মাণে সাহিত্যের এই প্রভাবগুলি কাজ করতে পারে। ঋত্বিক সে সময়ে যে সব প্রবন্ধ লিখছেন, তার একটির শিরোনাম 'সুইসাইড ওয়েভ ইন ক্যালকাটা'। অথবা ধরা যাক তাঁর ছোটগল্পগুলিতে আমরা অনেকসময়েই দেখি নানা চরিত্র মৃত্যুকে নির্বাচন করছে অথবা গল্পের কথক কোনো চরিত্রকে দুরবস্থা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য হত্যা করছে। যেমন 'এজাহার' গল্পের কথক জানায় ''জয়াকে মেরে ফেলা আমার উচিত হয়েছিল কিনা বলতে পারি না। তবে ওকে সুখ ও সম্মানদায়কভাবে মুক্তি দেবার ঐ একমাত্র উপায় বলে আমার মনে হয়েছিল''। কারণ জয়া যে জীবন যাপন করছিলো, তাতে

কথকের মনে হয়েছিল তার ''তিলে তিলে মৃত্যু একেবারে অবধারিত''। কিন্তু শুধুমাত্র কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির বোধেই নয়, আমাদের দেখা দরকার যে গোটা একটা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেই এই প্রবণতার পুনরাবর্তন কতটা ক্রিয়াশীল। কোনো ইতিহাসবোধেরই কি প্রতিস্থাপন ঘটছে এই মৃত্যুর নির্বাচনের প্রবণতায়?

আমি শেষ বেছে নেব শেষ আমায় বেছে নিক তিলে তিলে তা হতে দেব না!

> ধনের উৎপত্তি এবং ধনের ব্যাপ্তির মধ্যে যে ফাটল লুকিয়ে ছিল আজ সেটা উঠেছে মস্ত হয়ে। সভ্যতার ব্যবসায়ে মানুষ কোনো-এক জায়গায় তার দেনা শোধ করছিল না, আজ সেই দেনা আপন প্রকাণ্ড কবল বিস্তার করেছে। সেই দেনাকেও রক্ষা করব অথচ আপনাকেও বাঁচাব এ হতেই পারে না।
>
> — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'উপেক্ষিতা পল্লী', *পল্লীপ্রকৃতি,* ১৯৩৪

১৯৩০-এর দশকে বাংলায় খানিকটা ছড়িয়ে পড়েছে মার্কসবাদের প্রভাব, যে মার্কসবাদের প্রধান সূত্রগুলির একটি — দ্বান্দ্বিকতা — বারবার ফিরে আসে ঋত্বিকের ছবিতে। তাঁর ছবির চরিত্রগুলো জীবন মৃত্যুর টানাপোড়েনে ভিতরে ভিতরে ছিঁড়ে যায়, রক্তাক্ত হয়ে যায় বলেই, হয়তো এক 'সুডৌল আধুনিকতা'-র বদলে ছবিতে তিনি নিয়ে আসেন এক 'বিপর্যস্ত আঙ্গিক'। অর্থাৎ আধুনিকতা তাঁর কাছে ধরা দেয় অন্যভাবে। ঐতিহাসিক পার্থ চট্টোপাধ্যায় দেখিয়েছেন যে — আমাদের আধুনিক হওয়ার প্রক্রিয়ার ভেতরেই এমন একটা কিছু কাজ করছিল যার দরুণ আধুনিকতাকে গ্রহণ করেও তার মূল্য অথবা ফলাফল সম্বন্ধে বরাবর আমাদের সংশয় থেকে গিয়েছে। কারণ উপনিবেশের ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের আধুনিকতার ইতিহাস যেভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে, যাতে জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে অবারিত মুক্তচিন্তার নন্দনকাননের প্রতিশ্রুতি আমরা কখনই সেভাবে বিশ্বাস করতে পারিনি। প্রায় গোড়া থেকেই আমরা

আঁচ করেছিলাম, জ্ঞানচর্চার সঙ্গে ক্ষমতা বিস্তারের যে আধুনিক প্রক্রিয়া, তাতে বিশ্বজনীন আধুনিকতার আমরা কেবল গ্রহীতাই হতে পারব। স্রষ্টা হওয়ার সুযোগ কেউ আমাদের দেবে না। তাই গত দেড়শো বছর ধরে আমরা চেষ্টা করে এসেছি বিশ্বজনীন আধুনিকতার মায়াজাল সরিয়ে সেই জায়গাটুকু খুঁজে বের করার যেখানে আমাদের আধুনিকতার আমরাই হব কর্তা ..... যে প্রক্রিয়ায় আমরা আধুনিক হয়েছি, সেই একই প্রক্রিয়ায় আমরা আধুনিকতার শিকার হয়েছি। আধুনিকতার প্রতি আমাদের মনোভাব তাই গভীরভাবে দ্ব্যর্থব্যঞ্জক না হয়ে পারে না। ঋত্বিক তাই বুঝতে পেরেছিলেন যে নিজস্ব এক আধুনিকতার বিশিষ্ট রূপ উদ্ভাবন করতে হয়, তাহলে অন্যত্র প্রতিষ্ঠিত আধুনিকতাকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বর্জন করার সাহস দেখাতে হবে।

হেগেলের ভাববাদী দর্শন থেকে মার্কস তাঁর দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে এনেছিলেন বিচ্ছিন্নতার ধারণা, যেখানে মানবকেন্দ্রিক জগতে ক্রমে 'মানুষ'-ই চেতনার কেন্দ্র হয়ে ওঠায় প্রকৃতি থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, প্রকৃতি হয়ে যায় তার 'অপর'। পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় উৎপাদন ও শ্রম। আর প্রতীচ্যের সেই পুঁজিবাদী শিল্পভিত্তিক সমাজব্যবস্থার ছাঁচ ব্রিটিশ উপনিবেশের ফলে চেপে বসে ভারতের সামন্ততান্ত্রিক কৃষিভিত্তিক সমাজের উপর। ভাঙা সামন্ততন্ত্র ও আধা পুঁজিবাদের মিশ্রণে তৈরি হয়ে ওঠে এমন এক ব্যবস্থা — যা এই উপনিবেশের মানুষকে তার নিজভূমেই করে তোলে বহিরাগত শরণার্থী, যা নিজ সমৃদ্ধির জন্য তাদের ব্যবহার করলেও সে সমৃদ্ধির কোনো ফসল তারা পায় না। আর এভাবেই ব্যবহৃত হতে হতে ওই ব্যবস্থার সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয় তাদের। তারা বোঝে, এই ব্যবস্থায় মানুষ আর কোনো ব্যক্তি নয়, শুধু একটা চিহ্ন, যা দিয়ে তাকে নির্দিষ্ট করা যায়, অন্যদের থেকে আলাদা করা যায়। হয়তো এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়তে পারে 'রক্তকরবী'-র সেই সংখ্যাচিহ্নিত মানুষগুলির কথা। আর এই ব্যবস্থাই যখন প্রবল শক্তিশালী হয়ে ব্যক্তিকে গ্রাস করতে যায়, তখন ওই ব্যবস্থার

নিয়ন্ত্রণকে অস্বীকার করার বা প্রতিবাদের হয়তো একটা উপায় হতে পারে স্বেচ্ছাবৃত মৃত্যু। অর্থাৎ, মৃত্যু এখানে জীবন থেকে পালিয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আসে না, বরং কাঙ্ক্ষিত জীবনের আকুতি নিয়ে আসে; অনাকাঙ্ক্ষিতের আস্ফালনের উত্তরে প্রত্যাখ্যানের রাজনীতি নিয়ে আসে, কারণ তার পিছনে কাজ করে এক সামর্থ্যের বোধ।

এর পাশাপাশি মনে রাখা দরকার যে ১৯৫০-র দশকে বাংলায় অস্তিবাদী দার্শনিকদের লেখাপত্র নিয়ে চর্চা শুরু হয়ে গেছে। 'মিথ অফ সিসিফাস'-এ কামু দুটি বিকল্পের কথা বলেছেন — একটি হল আত্মঘাত এবং আরেকটি হল যন্ত্রণায় দীর্ণ হতে হতেও বাঁচা। এমনকি সেসময়ে বাঙালির সাংস্কৃতিক মানচিত্রে ঢুকে পড়ছে কীয়ের্কেগার্দ ও হাইদেগারের দর্শন। ঢুকে পড়ছে বোদলেয়র ও র‍্যাঁবোর কবিতার চর্চা। আর ওই সামর্থ্যের বোধের জোরেই হয়তো ঋত্বিকের ছবিগুলি মৃত্যুর দৃশ্যে শেষ না হয়ে জীবনের নতুন প্রবাহের দৃশ্য দিয়ে শেষ হয়। হয়তো কাঙ্ক্ষিত সেই জীবনের জন্যই নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও বাঁচার জন্য আর্তনাদ করে ওঠে নীতা, মৃত্যুর একদিন আগে আবার নতুন করে জীবন শুরু করতে চায় নীলকণ্ঠ।

নীতার ওই আর্তনাদ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মৈনাক বিশ্বাস দেখিয়েছেন যে—''সাইকো-অ্যানালিসিস যাকে বলে 'সিম্বলিক' জগৎ, এই ভাইবোনেরা পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে তার আওতা থেকে সরে যায়, সরে যায় লেনদেনের সেই সমাজ থেকে যেখানে সবকিছুর নাম পরিচয়সিদ্ধ, সবার নিয়তি ইতিমধ্যেই বিবৃত। ..... সিম্বলিক-এর বলয় থেকে অপসৃত হলে নীরবতার সৃষ্টি হয়, সৃষ্টি হয় জান্তব চিৎকার, ব্যাখ্যার অতীত যন্ত্রণার''। আসলে, যে নারীকে এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ শোষণের যন্ত্র বানায়, তাকেই আবার নিজের প্রয়োজনে দেবীত্বে উত্তীর্ণ করে। সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের মতে তাই ''নীতার চিৎকার তার সহসা উন্মোচিত স্মৃতির প্রত্যক্ষ পরিণাম; মনের এক গভীর উদ্বেগ থেকে জাত, যে তার 'আত্ম'-নির্মাণ মোটেই নিরাপদ ও স্থির

নয়। যক্ষারোগের স্তরে স্তরে নীতার শরীরে লাবণ্যহানির যে প্রক্রিয়া দেখতে পাই তা অব্যর্থ নির্দেশ করে দেয় শরীরের পরিসরে অবদমনের চিহ্নায়ন। ওই চিৎকার আসলে এক ধরণের হিস্টিরিয়া। দেবী থেকে মানবীতে পদার্পণের মুহূর্তই *মেঘে ঢাকা তারা*-র নায়িকার এক মাত্র জয়বার্তা। সে ব্যবস্থার মায়াবরণ ছিন্ন করে স্বরূপ দেখতে পেয়েছে।''

## আমাকে তুই আনলি কেন, ফিরিয়ে নে

দূত। ভাঙনের যিনি দেবতা তিনি সব সময় বড়ো পথ দিয়ে চলাচল করেন না। তাঁর জন্যে যে-সব ছিদ্রপথ থাকে সে কারও চোখে পড়ে না।

বিভূতি। (চমকিয়া) ছিদ্র? সে আবার কী? ছিদ্রের কথা তুমি কী জান?

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *মুক্তধারা,* ১৯১২

ফ্রয়েডের লেখায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন ঋত্বিক। ফ্রয়েড দেখিয়েছিলেন যে, যেহেতু প্রাণীর জন্ম নিষ্প্রাণ অবস্থায়, তাই সব প্রাণীই নিজের অজান্তে ঐ নিষ্প্রাণ অবস্থায় ফিরে যেতে উন্মুখ। ফলে তাদের স্বভাবে অনিবার্যভাবেই মৃত্যুর এক 'প্রবৃত্তি' থাকে। আসলে জন্মের মুহূর্তে জরায়ুর উষ্ণ পরিবেশ ও নিশ্চিন্ত বিরাম ত্যাগ করে প্রাকৃতিক শীতলতার মধ্যে নেমে আসাটাই একটা বিরাট ট্রমা, এক বঞ্চনার বোধ, প্রতিকারহীন এক অস্বস্তি। আর সবকিছুর মূলে আছে অপরিণত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হওয়ার বৈক্লব্য; অন্য যে-কোনো স্তন্যপায়ীর তুলনায় একটি মানবশিশু অনেক দুর্বল, ভঙ্গুর ও অপরিণত অবস্থায় জন্মায়। ওই অস্বস্তি বা জরায়ুর মধ্যে আবার ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে — এর ভগ্নাংশ উত্তরকালে পরিণত মানুষের অবচেতনে টিঁকে থাকে এবং তার প্রকাশ হয় স্বপ্নে, অন্ধকারের আকর্ষণে, গুহা-কুটির প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতীকে। একে বলা হয় মর্তুকাম বা মরণের ইচ্ছা। মৃত্যু এখানে শুধু ফ্রয়েড-কথিত 'প্রবৃত্তি' নয়, বরং মৃত্যু এখানে এক ক্ষুধার

বস্তু। প্রাচীনকালে বিভিন্ন যাদুকরী প্রক্রিয়ায়, বহু ধর্মতাত্ত্বিক আলোচনায় মাতার সঙ্গে মৃত্যুর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। আমাদের দেশেও নানাবিধ লোকসংগীত বা বাউলদের গানে মৃত্যুকে 'মায়ের কাছে ফিরে যাওয়া' বলে বর্ণনা করা হয়। ঋত্বিকের নানা ছবিতেও এর প্রতিফলন আমরা খুঁজে পেতে পারি।

*যুক্তি তক্কো আর গপ্পো*-য় রাতের অন্ধকারেই নীলকণ্ঠ বিপ্লবী ঘাঁটিতে আশ্রয় পায় ও তার মৃত্যুর ইচ্ছা জানায়; *বাড়ি থেকে পালিয়ে*-তে একটি গান শুনি 'মা গো আমার ডেকো না গো আর'; *সুবর্ণরেখা*-য় ঈশ্বর সীতার ঘরে ঢোকার সময়ে দেখি সেটাও এক অন্ধকার বদ্ধ পরিসর; *কোমল গান্ধার*-এর লালগোলা দৃশ্যে যৌথ বিস্মরণ থেকে সক্রিয় স্মরণের পরিসরে ফিরে আসার সময়ে ওই বিখ্যাত বাফার শটে ক্যামেরা আছড়ে পড়ায় খানিকক্ষণের জন্য স্তব্ধ ও অন্ধকার হয়ে যায় পর্দা; *মেঘে ঢাকা তারা*-য় যক্ষ্মা ধরা পড়ে পর নীতা এক অন্ধকার বদ্ধ ঘরে গিয়ে আশ্রয় নেয় এবং নেপথ্যে গান বাজে 'আয় গো উমা কোলে লই', নীতার ওই ঘর আসলে এমন এক 'অন্দরমহল' যা নীতাকে একধরণের 'দৃষ্টি'-র নির্মাণে সাহায্য করে।

মায়ের কাছে ফেরার ওই সূত্র ধরেই ঋত্বিকের ছবির 'মাদার আর্কিটাইপ' ব্যবহারে হয়তো পৌঁছোনো যায়। আবার ঋত্বিকের অধিকাংশ ছবিতেই বারবার বলা আছে ভাই ও বোনের ভালোবাসার কথা। মা ও ছেলের ঈডিপাস কমপ্লেক্সের থেকেও সমস্যাটা জটিল হয়ে ওঠে, যখন এই যুগল সম্পর্ক প্রতিস্থাপিত হয় ভাই ও বোনের বন্ধনে। কারণ ''এই ভাইবোনেরা দ্বি-সত্তা-ভিত্তিক যে বদ্ধ সম্পর্ক তৈরি করে তা এক অর্থে ইডিপাল পরিক্রমাকে অস্বীকার করে। এবং সেই অর্থেই ব্যক্তির নিয়মমাফিক 'ঐতিহাসিক' বিকাশেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে''। অবশ্য ঋত্বিক বারবার বলেছেন ছবিতে নিজে তাঁর 'মাদার আর্কিটাইপ' ব্যবহারের কথা। এবং তার কারণ হিসেবে ইয়ুং-এর মনঃসমীক্ষণের কথা, 'যৌথ সামাজিক অবচেতন'

থেকে এর উৎপত্তির কথা, এর ভয়াল ও অভয়া এই দুই রূপের। এই 'মাতা' একইসঙ্গে অবিভক্ত বাংলার প্রতীক, বাঙালির জাতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতীক এবং নদীমাতৃক এই কৃষিপ্রধান বাংলায় তা ভূমির প্রতীকও বটে। আর কৃষি-প্রভাবিত মানুষের মধ্যে মূলত দু-ধরণের প্রতিক্রিয়া কাজ করে। প্রথমত, সমস্তকিছু নস্যাৎ বা ধ্বংস করে ফেলা। আর দ্বিতীয় ধরণের মনোভাব হচ্ছে যে — কোনো একটা কিছু এসে এই দুর্বিষহ জীবন থেকে মুক্তি দেবে। 'স্বাধীনতার বিশ্বাসঘাতকতা', দেশভাগ, এমনকি কমিউনিস্টদেরও মিলিত সংগ্রামের বদলে ক্রমাগত দলীয় বিভাজন ও পারস্পরিক তিক্ততা — এসব স্বপ্নভঙ্গের মধ্যে দাঁড়িয়েও যখন কাজ করে চলেছেন ঋত্বিক, তখন ঐ 'কোনো একটা কিছু' হিসেবে কোন সত্যে পৌঁছতে বা আশ্রয় নিতে চেষ্টা করছেন তিনি? নাকি সমস্ত নস্যাৎ বা ধ্বংস না করতে পারায় বেছে নিচ্ছেন নিজেই নিজেকে ধ্বংস করার পথ? নাকি দুয়েরই মিলিত ফল এই মৃত্যুর নির্বাচন?

## ক্ষ্যাপা খুঁজে ফেরে পরশপাথর

> আজ মুনাফার আড়ালে মানুষের জ্যোতির্ময় সত্য রাহুগ্রস্ত। এই জন্যই মানুষের প্রতি কঠিন ব্যবহার করা, তাকে বঞ্চনা করা, এত সহজ হল।
>
> — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারী*, ৯-২-১৯২৫

ঋত্বিকের ছেলেবেলা কেটেছে দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে, কিন্তু তখন জোরকদমে শুরু হয়ে গেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি। শুরু হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, তার অভিঘাত এসে পৌঁছলো ভারতেও। তারপর এলো স্বাধীনতা। আর তার হাত ধরেই এলো দেশভাগ। শুরু হলো উদ্বাস্তু আগমন। বাংলাদেশের ভিটেমাটি ছেড়ে, নিজের শিকড় ছিঁড়ে চিরকালের জন্য এদেশে চলে আসার যন্ত্রণা, ফিরে যাওয়া অসম্ভব জেনেও বারবার সেখানে ফেরার জন্য আকুতি (মাতৃগর্ভে

প্রত্যাবর্তনের প্রতিস্থাপিত রূপ?) বারবার ফুটে ওঠে ঋত্বিকের ছবিতে। হেগেল বলেছিলেন এক যখন বিভক্ত হয়, তখনই সে আরও সত্যি হয়ে ওঠে। আর ঋত্বিকের চোখের সামনেই তো সেই এক, খান-খান হয়ে বহু এবং বহুতর হয়ে গেছে। পুঁজির ক্রিয়ায় আর ভেল্কিতে সত্যও মরীচিকার মতো নিরন্তর সরে সরে গেছে গেছে দূর থেকে দূরতর দিগন্তে। ঋত্বিক দেখেছেন পুঁজির দাপটে ভেঙে ভেঙে পড়ছে দেশ সমাজ সংস্থা। বিশ্লিষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমাদের মনন ও আবেগের সংহতি, বুদ্ধি আর বিবেকের ঐক্য। অমানুষিক ব্যবধান গড়ে তোলা হচ্ছে আমি আর না-আমি মধ্যে।

একের পর এক আন্দোলনের (তেভাগা আন্দোলন, খাদ্য আন্দোলন প্রভৃতি এবং সবশেষে নকশাল আন্দোলন) অস্থির ছিন্নভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়েই কেটেছে তাঁর জীবৎকাল। কোনো আন্দোলনই এনে দিতে পারেনি কাঙ্ক্ষিত সুস্থ সুন্দর পৃথিবী, কিন্তু রয়ে গেছে তার স্বপ্ন। আর সে স্বপ্নের দিকে হাঁটতে গেলেই পথে মুখোমুখি হতে হয় সত্যের। মেলোড্রামায়, যেখানে 'সামাজিক' প্রতিস্থাপিত হয় 'পারিবারিক'-এ, সেখানে দৈনন্দিনের মধ্যে দিয়েই সত্যের সেসব ধাপগুলি ফুটে ওঠে। কিন্তু সত্যের (মনে রাখা দরকার যে, *যুক্তি তক্কে আর গপ্পো*-য় নীলকণ্ঠের পুত্রের নাম 'সত্য', ভোরের আলোয় যার মুখ দেখে নীলকণ্ঠ বিদায় নিতে চেয়েছিলো) স্বরূপদর্শনও তো এক ভয়ংকর অভিজ্ঞতা!

১৯৩১-এ পৃথিবীর বিখ্যাত কয়েকজন মনীষীকে চিঠি লিখে উইল ডুরান্ট বুঝতে চাইছিলেন যে জীবনের আর কোন মানে আছে! লিখছিলেন—

> জ্যোতির্বিদরা আমাদের জানান এ-জীবন নক্ষত্রলোকের কাছে সামান্য এক মুহূর্ত মাত্র, ভূতাত্ত্বিকেরা জানান সভ্যতা হলো টিকে থাকবার জন্য একের সঙ্গে অন্যের ক্ষান্তিহীন যুদ্ধ, ঐতিহাসিকেরা বলেন প্রগতির ধারণা নিতান্ত এক অলীক ধারণা, মনোবিদেরা বলেন পরিবেশ বা পরম্পরার হাতে আমরা

কেবল যন্ত্র, যাকে বলি অক্ষয় আত্মা সে কেবল মস্তিষ্কের ক্ষণিক স্ফুরণ। শিল্পবিপ্লবের পরেই ভেঙে গেছে মানুষের সব গৃহাশ্রয়, জন্মনিরোধের আবিষ্কারে ভেঙে গেছে নীতির বা পরিবারের ধারণা, প্রেম আজ কেবল শারীরিক সংঘর্ষ, বিবাহ এক সুবিধাজনক সাময়িক চুক্তি। গণতন্ত্রের দেখেছি অতল পতন, সমাজতন্ত্র যেন ইউটোপিয়া। সমস্ত আবিষ্কারই শুধু বাড়িয়ে চলে শক্তিমানের শক্তি, দুর্বলকে তা করে দুর্বলতর। কোনো দূরবীক্ষণে বা অনুবীক্ষণে ঈশ্বরকে আর মেলে না কোথাও, সমস্ত বেদনার আশ্রয় হতে পারতেন যে ঈশ্বর। তবে কি সত্যের আবিষ্কারই ছিল মানবেতিহাসের সবচেয়ে বড় ভুল?

— অনুবাদ শঙ্খ ঘোষ; *জার্নাল*, ১৩৯২ বঙ্গাব্দ

## আরেক রকম চরিত্রবান

নন্দিনী। আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে তোমার সঙ্গে আমার লড়াই।

রাজা। আমার সঙ্গে লড়াই করবে তুমি! তোমাকে যে এই মুহূর্তেই মেরে ফেলতে পারি।

নন্দিনী। তার পর মুহূর্তে মুহূর্তে আমার সেই মরা তোমাকে মারবে। আমার অস্ত্র নেই, আমার অস্ত্র মৃত্যু।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রক্তকরবী*, ১৯২৬

সমাজশৃঙ্খলা প্রত্যেকের জন্যই বিভিন্ন সামাজিক ভূমিকার (বউ, প্রেমিকা, বোন, বুদ্ধিজীবী প্রভৃতি যে কোনো ক্ষেত্রেই) ছাঁচ তৈরি করে রেখেছে। সেই ছাঁচের মাপে নিজেকে কেটেছেঁটে খাপ খাইয়ে নিয়েই বেঁচে থাকতে হয় একজন সামাজিক মানুষকে। *তিতাস একটি নদীর নাম*-এর প্রায় শেষদিকে বাসন্তী তাই বলে যে, বাসন্তী নামটাকে আর আজকাল চিনতে পারে না সে। বাসন্তী থেকে সুবলের বউ, তারপর অল্পবয়সী বিধবা রাঁঢ়ী, তারপর অনন্তর মাসী . . . এইভাবে বিভিন্ন পরিচয়ের আড়ালে সে ভুলতে বসেছে যে, শেষে আবার সে বাসন্তীতে ফিরে এসেছে। আসলে এই ছাঁচগুলোয় কেউ কেউ ঠিকমতো খাপ খাওয়াতে পারে না। যেমন — নীলকণ্ঠ কোনো ছাঁচেই নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে নি। সীতা 'প্রেমিকা'-র ছাঁচে নিজেকে

খাপ খাওয়ালেও 'বোন'-এর ছাঁচে তা পারে নি। আর নীতা সমস্ত ছাঁচে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করলেও নিজের জন্য স্বার্থপর হতে — অর্থাৎ 'অস্তিত্বের জন্য লড়াই' এবং 'যোগ্যতমের উদবর্তন'-এর প্রাথমিক শর্তটিই পালন করতে — পারে নি। তাছাড়া এই পুরুষনিয়ন্ত্রিত সমাজে সে এমন এক অবস্থান নিয়েছে, এমন এক 'দৃষ্টি'-র অধিকারী হতে চেয়েছে যা অনুমোদিত নয়। এবং সেটাই নীতার 'পাপ'।

শৃঙ্খলাভঙ্গের অপরাধে তাই তাদের শাস্তি দেয় সমাজ। শাস্তির খাঁড়া নেমে আসে তাদের 'যুগ্ম পরিসর'-এর উপর — নীতাকে ছেড়ে যায় সনৎ, গীতার স্বামী অভিরাম মারা যায়, নীলকণ্ঠকে ছেড়ে যায় দুর্গা — অর্থাৎ তাদের 'এরোস'-এর উপর চূড়ান্ত আঘাত আসে। এ অবস্থায় একজন ব্যক্তি বুঝতে পারে, তার নিজের মতো বাঁচার কোনো অধিকার নেই; কিছুই তার নিজস্ব নয়, সমস্তটাই নিয়ন্ত্রণ করছে সমাজ নামক সর্বগ্রাসী প্রতিষ্ঠান। বরং মৃত্যুই একমাত্র মানুষের নিজের, যার সঙ্গে অন্যের কোনো যোগাযোগ নেই, সম্পর্ক নেই কোনো আন্তর্ব্যক্তিকতার। প্রতীকী শৃঙ্খলার চাপে অস্তিত্ব যখন অসহনীয় হয়ে ওঠে, যখন 'আন্তর্ব্যক্তিক চোর-পুলিশ খেলা'-য় ব্যক্তি বলে 'না', তখনই প্রবল হয় আত্মঘাতের বাসনা — গড্ডলিকা প্রবাহ থেকে নিজেকে সরিয়ে আনার ইচ্ছা। আর ফ্রয়েডিয় দ্বৈতবাদে 'এরোস'-এর বিপরীতে 'থ্যানাটোস'। শাস্তি হিসেবে তাই প্রথমটির উপর চূড়ান্ত আঘাত এসে পড়লে, তখন একমাত্র বিকল্প থাকে দ্বিতীয়টিকে বেছে নেওয়া, অর্থাৎ মৃত্যুর নির্বাচন।

*অযান্ত্রিক*-এ দেখি অন্য ড্রাইভাররা খেপায় যে জগদ্দলই নাকি বিমলের অওরৎ। তাই পলাতকা মেয়েটির আবির্ভাবেই সে অস্থির হয়ে ওঠে। এমনকি পরে, প্রেমিক-পরিত্যক্তা মেয়েটি ট্রেনে চলে যাওয়ার পর, বিমল যখন গাড়ি চালিয়ে পরের স্টেশনে তাকে ধরতে যায়, তখনই মাঝরাস্তায় সম্পূর্ণ বিকল হয়ে পড়ে জগদ্দল। 'এরোস'-এ আঘাত আসায় বেছে নেয়

'থ্যানাটোস'-কে। আসলে এছাড়া আর কোনো উপায় নেই। নাহলে ব্যক্তির দিকেই তিলে তিলে মৃত্যুকে এগিয়ে দেবে সমাজ, তার চেয়ে বরং ওই ব্যক্তি নিজেই এগিয়ে যেতে চায় মৃত্যুর দিকে। এভাবে মৃত্যুর নির্বাচনই হয়ে ওঠে সমাজের নিয়ন্ত্রণ ও শাস্তিদানের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ। মৃত্যুমুহূর্তে নীলকণ্ঠ তাই মদ ঢেলে দেয় ক্যামেরার লেন্সে, যে লেন্স আসলে ধ্রুপদী বাস্তববাদী ধারায় অভ্যস্ত চোখ। ধ্রুপদী বাস্তববাদের প্রতি ঋত্বিকের এই অনীহার কারণ রয়ে গেছে বাংলার সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ইতিহাসে। আমরা যাকে বলি 'বাংলার রেনেসাঁস' বা নবজাগরণ বা আলোকপর্ব বলি, তারই তো ফসল এই লব্ধ আধুনিকতা, এই ধ্রুপদী বাস্তববাদ। এই আলোকপর্বকে, তার সামাজিক-সাংস্কৃতিক অভিঘাতকে কীভাবে দেখেছেন ঋত্বিক?

## আলো ক্রমে আসিতেছে?

রণজিৎ। কী হল আর-একটু বলো।

সঞ্জয়। ঐ বাঁধের একটা ত্রুটির সন্ধান কী করে তিনি জেনেছিলেন। সেইখানে যন্ত্রাসুরকে তিনি আঘাত করলেন, যন্ত্রাসুর তাঁকে সেই আঘাত ফিরিয়ে দিলে। তখন মুক্তধারা তাঁর সেই আহত দেহকে মায়ের মতো কোলে তুলে নিয়ে চলে গেল।

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *মুক্তধারা,* ১৯২২

''কথাটা বোধহয় — নিশ্চিন্দি, আমার ঠাকুমা বলতেন। সেই নিশ্চিন্দি বোধহয় আর আমরা ফিরে পাবো না। মনে হয় আমরা যেন কেমন বাইরের লোক হয়ে গেছি।'' অনসূয়া বলেছিলো ভৃগুকে, লালগোলা দৃশ্যে। কিন্তু কোথায় ছিলো সেই নিশ্চিন্দির আশ্রয়? নিশ্চিন্দিপুরে? সত্যজিতের *পথের পাঁচালি*-তে, নিশ্চিন্দিপুরে আধুনিকতার প্রবেশমুহূর্তই (অপু-দুর্গার ট্রেন

দেখা) কিন্তু ছিলো গ্রামবাংলার আদিপ্রতিমা ইন্দির ঠাকরুণের মৃত্যুমুহূর্ত। তারপর ক্রমে ক্রমে নিশ্চিন্দিপুরের পরিসর ছেড়ে বেরিয়ে এসে অপুকে পা রাখতে হবে আধুনিকতার পরিসরে। যেন প্রাক-আলোকপর্ব থেকে আলোকপর্বে তার পা তোলা, পা ফেলা।

এই আলোকপর্বকে সত্যজিৎ দেখেছেন একভাবে, ঋত্বিক আরেকভাবে। সত্যজিতের কাছে ওই পর্বটি এক স্বাভাবিক ঐতিহাসিক পরিণতি, যা একটি ছাঁকনির মতো কাজ করে, যার মধ্যে দিয়ে জাতীয় সনাতন সংস্কৃতি এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির নির্যাস এসে এক মিলিত সমৃদ্ধ ধারা তৈরি করে উত্তর-আলোকপর্বে। কিন্তু ঋত্বিকের কাছে ওই পর্ব জবরদস্তি ছাপিয়ে দেওয়া এক বাধা বা পাঁচিলের মতো, যা আমাদের শিকড় উপড়ে নিয়ে উদ্বাস্তু করে দেয় জাতীয় সনাতন সংস্কৃতি থেকে। সেই শিকড়ও তো মাতৃগর্ভেরই মতো। আর তাই সেখানেই বারবার ফিরে যেতে চান ঋত্বিক। যৌথ বিস্মরণের বর্তমান বাস্তবতাকে নস্যাৎ বা অস্বীকার করে তাই তিনি উত্থাপন করতে চান সক্রিয় স্মরণের এক বিকল্প প্রস্তাব।

তাঁর ছবিতে যাত্রাধর্মী অভিনয়শৈলী ও মেলোড্রামার ব্যবহার, ওয়াইড অ্যাঙ্গল লেন্স ব্যবহারে বারবার ছবির গভীরতা নষ্ট করে তাকে দ্বিমাত্রিক করে তোলা, শব্দকে দৃশ্যের সঙ্গে সমান্তরাল অক্ষে না রেখে তাতে আলাদা গুরুত্বদান, *যুক্তি তক্কো আর গপ্পো*-য় জড়ানো পটের মতো ভূমিকালিপি ব্যবহার ইত্যাদি ইঙ্গিত সেদিকেই নির্দেশ করে। তাঁর হাতিয়ার হয়ে ওঠে এপিক-রীতি, যে এপিক ঐকত্রিক মনের সৃষ্টি; আণবিক ব্যক্তিমনের নয়। যা সাযুজ্য খোঁজে এমন এক চেতনাকেন্দ্রের যার অবস্থান এই সমাজে, অথচ যে এ-সমাজের নয়। যার অবস্থান এই সময়ে, অথচ যে নিজে জায়মান ভবিষ্যৎ।

আলোকপর্বের যে আধুনিকতা, তার আলোতেই শিক্ষিত ছিলেন ঋত্বিক। তিনি বুঝেছিলেন যে ঐতিহাসগতভাবেই ওই শিকড়ে ফিরে যাওয়া বাস্তবে আর সম্ভব নয়, কিন্তু তবু তার চেষ্টা

করে যেতেই হবে। তাই একই সঙ্গে তাঁর এই স্বপ্ন এবং স্বপ্নভঙ্গ তৈরি করে তোলে থিসিস এবং অ্যান্টিথিসিসের এমন এক চক্রব্যূহ, যা থেকে উদ্ধারের কোনো পথ জানা নেই, যা কোনো সিন্থেসিসের দিশা দেখায় না। সেজন্যই হয়তো যুক্তি তক্কো আর গপ্পো-য় নীলকণ্ঠ বলে — আমি ''কনফিউজড, আটারলি কনফিউজড, দিশেহারা হয়ে হাতড়ে হাতড়ে বেড়াচ্ছি। হয়তো আমারা সবাই কনফিউজড''। তাহলে কি এই সনাতন ঐতিহ্যময় কৃষিপ্রধান লোকালয়ে উপনিবেশগত কারণে পাশ্চাত্য আধুনিকতার প্রবেশ ঘটায়, এখানকার আধুনিকতার ইতিহাস নিজের নিয়মেই তৈরি করে তুলেছে এমন এক ব্যবস্থার গোলকধাঁধা, যার থেকে আধুনিক মানুষ নিজেও বেরোনোর পথ জানে না? সে জন্যই কি সে নির্বাচন করে নিতে পারে মৃত্যু?

———